রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে
সুশাসন ও শুদ্ধাচার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

কার্যপত্র প্রণয়ন
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাহিদ শারমীন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. শহিদুল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। খসড়া কার্যপত্র পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার

১. প্রেক্ষাপট

সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (এসডিজি) এর অভীষ্ট ১৬-তে "টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ"-এর কথা বলা হয়েছে। এই অভীষ্টের মধ্যে আরও যেসব লক্ষ্য রয়েছে, যেমন"সব প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ হ্রাস করা" (১৬.৫); "সব স্তরে কার্যকর, দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান" (এসডিজি ১৬.৬); "সব স্তরে সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্তগ্রহণ" (১৬.৭); এবং "জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা" (১৬.১০), সেসব লক্ষ্য সরাসরি সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের প্রথম ধাপ অতিক্রম করে। এরই ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের মাধ্যমে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। উল্লেখ্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-তে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম। এই শুদ্ধাচার কৌশলে এসব দলের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ও আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসের প্রেক্ষিতেসুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২. কার্যপত্রের উদ্দেশ্য, আওতা ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এই কার্যপত্রের উদ্দেশ্য সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও তার প্রেক্ষিতে বাস্তবতা পর্যালোচনাকরা, এবং আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার সংক্রান্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এ কার্যপত্রে একাদশ সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দল, যেমন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি (জাপা) এবং অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘোষিত ইশতেহার এ কার্যপত্রে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই কার্যপত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রধানত প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, নির্বাচনী ইশতেহার ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও বিশ্লেষণ। এছাড়াবিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাবেক নির্বাচন কমিশনার, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিও সংবাদমাধ্যম কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. রাজনৈতিক দল, সুশাসন ও শুদ্ধাচার: মূল ধারণা

রাজনৈতিক দল: প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে যথাযথভাবে কার্যকরকরার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে রাজনৈতিক দল, যা ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দল বলতে "এমন একটি অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনো নামে কার্য করেন এবং কোনো রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসংঘ হইতে পৃথক কোনো অধিসংঘ হিসেবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন" (অনুচ্ছেদ ১৫২)। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক মত প্রচার বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করা, এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের অঙ্গীকার নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে প্রকাশ করা। রাজনৈতিক দলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া, এবং প্রধান ভূমিকা হচ্ছে জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করা, সরকার গঠন করা, নীতিগত অবস্থান ও কার্যক্রম তৈরি করা, রাজনৈতিক নিয়োগ ও সামাজিকীকরণ, প্রতিনিধিত্ব করা, সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ করানো, ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়া ও জাতীয় ঐক্য তৈরিতে সহায়তা করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, রাজনৈতিক বিষয়ভিত্তিক আন্দোলন সংগঠন করা - সার্বিকভাবে গণতন্ত্রায়ণে সহায়তা করা। সার্বিকভাবে গণতন্ত্রায়ণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, বিরোধী দল হিসেবে সরকারের সমালোচনা করা, জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করা রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সুশাসন: সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে, আইনি অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, নির্দ্বিধায় দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ভিন্নমত পোষণ করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন নীতি তৈরি ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতাকেসুশাসন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সর্বোপরি, এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম তদারকির জন্য কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ওপর নাগরিক ও রাষ্ট্রের আস্থা প্রকাশ করে। সুশাসনের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, সক্ষমতা ও কার্যকরতা। এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংঘাতের অনুপস্থিতি, সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা, সমঝোতা, এবং সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকেও সুশাসনের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

শুদ্ধাচার: শুদ্ধাচার বলতে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে বোঝায়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ অনুযায়ী সার্বিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছতা, তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অডিট, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতিতেশুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা জরুরি।

৪. রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়া

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়া অনেকটা একইরকম। নির্বাচনের আগে কোনো দলের নির্বাচনী কমিটির অধীনে সাব-কমিটি গঠন করা হয়, যার ওপর থাকে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির দায়িত্ব। এই সাব-কমিটি একটি খসড়া নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করে ও তা নিয়ে কমিটিতে আলোচনা করে। আলোচনার ভিত্তিতে খসড়া সংশোধন করা হয় ও দলের সভাপতির কাছে পেশ করা হয়। সভাপতির মতামতের ভিত্তিতে এটি আবার সংশোধন ও চূড়ান্তকরা হয়। সবশেষে চূড়ান্ত নির্বাচনী ইশতেহার দলীয় সভাপতির অনুমোদনক্রমে ঘোষিত হয়। তবে বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কয়েকজনের ওপর নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির দায়িত্ব থাকে বলে দেখা যায়। নির্বাচনী ইশতেহারের খসড়া দলীয় উচ্চপর্যায়ে আলোচিত হয় এবং দলীয় প্রধানের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়। সব ক্ষেত্রেই দলীয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মতামত নেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে বলে জানা যায়।

৫. সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৮৮ ও ১৯৯৬ (৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন) সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছাড়া সকল সংসদ নির্বাচনে এই রাজনৈতিক দলটি অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বিষয় ছিলো সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। দ্বিতীয় (১৯৭৯) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মূল অঙ্গীকার ছিলো সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়।পঞ্চম (১৯৯১) ও সপ্তম (১৯৯৬) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিলো যথাক্রমে গণতান্ত্রিক সরকার ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন, সংবিধানের কার্যকরতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দলীয় প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র, ও সব নাগরিকের সমান অধিকার খর্ব করে এমন আইন বাতিল করা। একইভাবে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০১) অঙ্গীকারে নতুনভাবে সংযোগ করা হয় সংসদে নারীদের আসন বাড়ানো, স্বাধীন দুর্নীতি দমন পরিষদ প্রতিষ্ঠা, ন্যায়পাল নিয়োগ, এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অঙ্গীকার ছিলো সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত, যা ‘২০২১ সালের রূপকল্প: দিনবদলের সনদ’ নামে প্রকাশিত। এই নির্বাচনী অঙ্গীকারেরঅন্যতম মূল অগ্রাধিকার ছিল গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা; বিচার বিভাগের দৃশ্যমান স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা; দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সব ধরনের ঘুষ-চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা; মতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা; তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়ে অঙ্গীকার ছিল উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষ ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদকে কার্যকর করা ও সংসদের ভেতরে-বাইরে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন; ন্যায়পাল নিয়োগ; মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করা; সরকারের সব পর্যায়ে ই-গভার্নেন্স প্রবর্তন; বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সব ধরনের ঘুষ-চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি

দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের অপব্যবহার রোধে আইন ও নীতি তৈরির অঙ্গীকার করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রত্যেক ইশতেহারে মূল কেন্দ্রবিন্দু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, এবং পরবর্তীতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অঙ্গীকার ইশতেহারে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়। এখানে আরও উল্লেখ্য, নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, যেমন- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি দমন, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসন, ন্যায়পাল নিয়োগ, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, অবাধ তথ্য প্রবাহসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। এছাড়া পরবর্তীতে সাম্প্রতিক সমস্যা যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অপব্যবহার রোধ, ই-গভার্নেন্স ইত্যাদি যুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি): ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেবিএনপিতৃতীয়, চতুর্থ ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া সকল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এই রাজনৈতিক দলটি দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯ দফা ইশতেহার ঘোষণা করে, যেখানে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের সব স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা, এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করা হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র ইশতেহারে ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করার মাধ্যমে দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার করা হয়। পরবর্তীতে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি; ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করা; নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা; রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা; গ্রাম সরকার প্রবর্তন; এবং সংসদে নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসন বাড়ানোর অঙ্গীকার করা হয়।

সর্বশেষ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র ইশতেহারেসব ধরনের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন; সুশাসনের কেন্দ্র হিসেবে সংসদের ভূমিকা বাড়ানো ও বিরোধী দলের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা; বিষয়ভিত্তিক ব্যতীত ওয়াক-আউট ও অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক বিধি-নিষেধ আরোপ; সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাম সরকার প্রবর্তন; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও ডিজিটাল কেস ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; দুর্নীতির উৎস বন্ধ করা, সরকারের সব কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; সব সংসদ সদস্যকে শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে বাধ্য করা; এবং দুদকের স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি তৈরি করার অঙ্গীকার করা হয়।

বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারগুলো পর্যালোচনা করলে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করা, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদকে কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখা যায়।

জাতীয় পার্টি (জাপা): ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন ছাড়া সব সংসদ নির্বাচনে জাপা অংশগ্রহণ করলেও ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করা হয় নি বলে জানা যায়। জাপা'র নির্বাচনী ইশতেহারগুলোতেনির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা; উচ্চ আদালতে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো; সব ধরনের 'কালো আইন' বাতিল করা; গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; সংসদে নারীদের আসন ৬৪টি করা; উপজেলা আদালতসহ পূর্ণ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গীকারগুলো ছিলো উল্লেখযোগ্য। তবে দশম সংসদ নির্বাচনে ওপরের অঙ্গীকারগুলোসহ 'প্রাদেশিক কাঠামো' ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং স্থানীয় উন্নয়নে জন-প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার করা হয়। জাপা'র নির্বাচনী ইশতেহারগুলোতে মূলতপ্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার ধারাবাহিক অঙ্গীকারলক্ষ করা যায়।

অন্যান্য দল

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল: এই দলের ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা (স্থায়ী কমিটির গণশুনানি, ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন); তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (পুলিশ কমিশন গঠন); স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত প্রশাসন; দুর্নীতি দমন (দুদকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, দুর্নীতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি) অঙ্গীকার বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

ওয়ার্কার্স পার্টি:২০১৪ সালের নির্বাচনে এই দলের ইশতেহারে প্রশাসনের সব স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; ই-গভার্নেন্স প্রবর্তন; দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন; দুর্নীতি রোধ (রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত); প্রশাসনের গণতান্ত্রিক

বিকেন্দ্রীকরণ; দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগে; মেধার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ; দ্রুত বিচার; কার্যকর সংসদ (নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন); তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি:২০০৮ সালের ইশতেহারে ঘুষ-দুর্নীতি কমানো; ন্যায়পাল ব্যবস্থা চালু; দুদকের সক্ষমতা বাড়ানো; ক্ষমতার কার্যকর গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনের কাঠামো পুনর্বিন্যাস; সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল:১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রায় একই ধরনের অঙ্গীকার করা হয়, যার মধ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনি কাঠামো পরিবর্তন; জাতীয় সরকার গঠন; অবৈধভাবে অর্জিত সকল অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা; সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা নিশ্চিত করা প্রদান; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা; সামাজিক নিরাপত্তা; স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন; সম্পদের হিসাব প্রকাশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গণফোরাম:২০০৫ সালে প্রস্তাবিত ২৩ দফায়আইনের নিরপেক্ষ ও কার্যকর প্রয়োগ, মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সকল আইন ও বিধি বাতিল; বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ; প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দলীয়করণ বন্ধ, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান; নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা; জাতীয় সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; সর্বস্তরের স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও ক্ষমতায়ন করে শক্তিশালী ও কার্যকর করা; মন্ত্রী, এমপিসহ সকল দলে রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ ও তার নিয়মিত তদারকি; ঋণ খেলাপি ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, অসদুপায়ে অর্জিত সকল অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; সংবাদপত্র ও রেডিও-টেলিভিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান; অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ: ২০০৮ সালের ইশতেহারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া; চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, ও অসৎ নেতৃত্বমুক্ত রাখতে জনমত গড়ে তোলা; রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠাকল্পে দলভিত্তিক সংসদ নির্বাচন; জনপ্রতিনিধিসহ সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীর দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে তিনগুণ শাস্তির ব্যবস্থা; রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিশন গঠন; সকল পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্মানজনক বেতন ভাতা, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও পদোন্নতির ব্যবস্থা; উপজেলা আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন; এবং সকল গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণ-মাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

৬. নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা

৬.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক দলগুলোর সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোসুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দেখা যায়। এসব পদক্ষেপের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা), বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী ও দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক আইন ও নীতি প্রণয়ন (সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া সংসদ সদস্যপদ প্রার্থীদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা, এবং নির্বাচন ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদ, সরকারি বিভিন্ন সেবা ও ক্রয়ে ডিজিটালাইজেশন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গণশুনানি প্রবর্তন করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধিকরা হয়েছে। সরকারের সাথে প্রশাসনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সততা পুরস্কার নীতি ২০১৭ প্রবতর্নের মাধ্যমে প্রশাসনিক শুদ্ধাচার চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধনের মাধ্যমে সবগুলো দলের বার্ষিক আর্থিক তথ্য ও নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু যথেষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও দেশেবৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় ধরনের দুর্নীতির বিস্তার লক্ষ করা যায়। সরকারি সেবা খাতে ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বলে দেখা যায়। টিআইবি জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী সেবাগ্রহীতা খানার ৬৬.৫% দুর্নীতির শিকার।এছাড়াও সুশাসন ও দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান ধারাবাহিকভাবে নিচের দিকে রয়েছে। বিভিন্ন দলীয় সরকারের সময়েদুর্নীতিবিরোধী আইনের প্রয়োগে কাঠামোগত বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমনআইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতির বিধান করা, বা কোনো কোনো খাতে সরকারের জবাবদিহি করার ব্যবস্থা সঙ্কুচিতকরা।

জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির বৈঠক নিয়মিতভাবে না হওয়া, সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের ঘাটতি,সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের অজুহাতে সংসদ সদস্যদের মত প্রকাশে কাঠামোগত বাধা,সংসদে বিরোধী দলের বয়কট থেকে শুরু করে আত্মপরিচয়ের সংকটাপন্ন বিরোধীদলীয় সংস্কৃতি, সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে অধিকতর আগ্রহের সংস্কৃতি,সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইনের ঘাটতি, এবং স্থায়ী কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকার ফলে সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হতে পারে নি,এবংসরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা যায় নি। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব দেখা যায়। এছাড়া একই প্রভাবেবিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগ থেকে শুরু করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচরণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণেও দলীয় রাজনীতির প্রভাব লক্ষণীয়।

অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল গণমাধ্যম, ব্যবসায়, নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা ও চর্চা বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬ ও প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮উল্লেখ করা যায়। এছাড়া ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন বা আইনের ধারা (যেমন বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪)কখনো বাতিল করে নি। এছাড়া প্রত্যেক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও এ পর্যন্তক্ষমতায় যাওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, উপরন্তুকর ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়ার পরও তা বিলুপ্ত করা হয়।রাজনৈতিক দলগুলো অডিটকৃত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে দাখিল করলেও এসব তথ্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত নেই।

৬.২ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক দলগুলোরনির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক লক্ষ করা যায়। ইতিবাচক দিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, এবং এর অংশ হিসেবেবহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবিতেসামরিক শাসকের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বর্জন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন যার মাধ্যমে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে সংসদ ও স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতির আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে দেখা যায়।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতাকে একচ্ছত্রভাবে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতাবিদ্যমান - ক্ষমতায় থাকাকালীন নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নির্বাচনে হেরে গেলে ফলাফল মেনে না নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া বেশিরভাগ দলে নেতৃত্ব নির্বাচন, নারীদের অংশগ্রহণ, সম্মেলন আয়োজন, স্থানীয় কমিটি গঠন, প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চায় ঘাটতি দেখা যায়।

৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রেক্ষাপটের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। যেখানেস্বাধীনতার আগের নির্বাচনে (১৯৭০)মূল অঙ্গীকার ছিলো সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সেখানে ১৯৭৫ সালের পর থেকে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং আরও পরে ১৯৯০-এর দশকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও একে কার্যকর ও শক্তিশালী করা, সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম আরও দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ করার অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়।

প্রধানত সপ্তম সংসদ নির্বাচনের সময় থেকে বেশিরভাগ দলের ইশতেহারে দুর্নীতি দমন ও সুশাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার দেখা যায়, যার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বাধীন দুর্নীতি দমন সংস্থা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তুদুর্ভাগ্যজনকভাবে, দুর্নীতির আরওব্যাপক বিস্তার ঘটেছে।

বেশিরভাগ দলের বিশেষ কয়েকটি অঙ্গীকার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়, যেমন ন্যায়পাল নিয়োগ (আওয়ামী লীগ, বিএনপি), 'কালো আইন' বাতিল (আওয়ামী লীগ, জাপা), স্বাধীন বিচার বিভাগ (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাপা), স্বাধীন গণমাধ্যম (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাপা), জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ (বিএনপি), গ্রাম সরকার প্রবর্তন (বিএনপি), বা উপজেলা আদালত ও প্রাদেশিক সরকার গঠন (জাপা)।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ দলের অনেক অঙ্গীকার থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়াওসুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো কোনো অঙ্গীকার পূরণ করা হলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকার, যেমন কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, ন্যায়পাল নিয়োগ, 'কালো আইন' বাতিল, জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি কখনোই পূরণ করা হয় নি বলে দেখা যায়। অন্যদিকে বাক-স্বাধীনতা, মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করার মতো বিতর্কিত বা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সব দলই সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন অঙ্গীকার করলেও বিরোধী দল হিসেবে ইশতেহারে অঙ্গীকারকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শুদ্ধাচার চর্চার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফলে ইশতেহারের প্রভাব লক্ষণীয়, যদিও অনেকক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে ইশতেহার প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

৮. সুপারিশ

কার্যপত্রে আলোচিত বিষয় বিবেচনা করে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. সরকার গঠনকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে পূর্ববর্তী নির্বাচনে দেওয়া অঙ্গীকার কতটুকু পূরণ করেছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
২. নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন না করতে পারলেও বিরোধী দল হিসেবে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা থাকবে তা ইশতেহারে স্পষ্ট করতে হবে।
৩. প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুসরণ করে কর্মপরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে, এবং প্রতিবছর তা পর্যালোচনা করতে হবে।
৪. রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র ও সুশাসনের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করতে হবে। এসব অঙ্গীকার কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখাও থাকতে হবে।
৫. সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিচের বিষয়গুলো ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ক. সংসদ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৬)

- সংসদে সরকারি দলের একচ্ছত্র ভূমিকার চর্চা নিরুৎসাহিত করতে বৈধ ও আগ্রহী সকল দলের কার্যকর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও নির্বাচিত সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; দলীয় প্রধান, সরকার প্রধান ও সংসদ নেতা একই ব্যক্তি না হওয়া।
- বিরোধী দলকে সংসদীয় কার্যক্রমে আরও বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া (ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে বিরোধীদলীয় সদস্যকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন)।
- সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়ন; সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও এ সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করা।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করা; উদাহরণস্বরূপ একইসাথে শ্রমিক বা মালিক ইউনিয়নের নেতা ও মন্ত্রীত্বের পদে আসীন না হওয়া; জনপ্রতিনিধি বা সরকারি পদে আসীন হয়ে সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো লাভজনক কর্মকাণ্ডে নামে-বেনামে সম্পৃক্ত না হওয়া।
- সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ও এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা।
- রাজনৈতিক দলগুলোর সকল পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বৃদ্ধি করা; দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা; রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করা।

খ. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার চর্চা সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৪, ১৬.৫)

- দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও কমিশনার/সদস্যসহ সকল নিয়োগ/নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ এবং দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা পরিহার করা ও প্রয়োজনে সংস্কার করা।

- এমন কোনো আইনি সংস্কার না করা যা দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকরতা খর্ব করতে পারে।
- সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি প্রক্রিয়া মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা।
- রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা প্রত্যাহার বন্ধ করা।
- জাতীয় বাজেটে কালো টাকাকে বৈধতা না দেওয়া; পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত নিয়ে আসা।
- সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ও গুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পাল নিয়োগ করা।
- উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- রাজনৈতিক প্রভাববর্জিত, বাস্তবসম্মত এবং জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন করা - প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার চর্চা প্রতিষ্ঠিত করা; প্রকল্পের বাস্তবায়নে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানে নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করা; ক্রয় প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ বা প্রভাব বন্ধ করা; ই-প্রকিউরমেন্টের পূর্ণ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ক্রয় নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

গ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৩)

- বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পেশাদারী উৎকর্ষ ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও পরিপূরক কৌশল গ্রহণ এবং সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।
- বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা।
- বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করা; সৎ, মেধাবী, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা।
- উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করা।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এমন সব ধরনের আইন ও বিধি বাতিল করা; জবাবদিহিতা সঙ্কুচিত করে এমন আইন ও বিধি বাতিল করা।
- বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম, নির্বিচারে আটকসহ সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা।

ঘ. জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৭)

- কেবলমাত্র যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন করা; প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, প্রশাসনসহ সকল সরকারি খাতে আধুনিক কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করা।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষমতায়িত, গতিশীল ও দায়বদ্ধ করার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা।
- উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করা।

ঙ. নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৭)

- রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য ধর্ম ও নারী, শিশু ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহার বন্ধ করা।
- সব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের প্রতি বৈষম্যমূলক সব আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীদের কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩৩% করা ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।

চ. তথ্য অধিকার, মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.১০)

- তথ্যের অভিগম্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোনো আইন প্রণয়ন না করা; তথ্য অধিকার আইনবিরোধী এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পরিপন্থী বিভিন্ন নিবর্তনমূলক উপধারা বাতিল করা।
- এমন কোনো আইন না করা যা মুক্ত ও স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের পরিপন্থী বিশেষকরে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিবর্তনমূলক সকল ধারা এবং বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪ ধারাসহ মতপ্রকাশ ও সংগঠন করার সাংবিধানিক অধিকার খর্বকারী সকল আইন ও আইনের ধারা বাতিল করা; গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ব্যবসা, রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য অপ্রকাশযোগ্য বিষয়ের জন্য ব্যতিক্রম সাপেক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সকল প্রকার গোয়েন্দা সংস্থা, এবং গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা।
- তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের চাহিদা, উভয় ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সরকারি মালিকানাধীন বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।

****